International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.108-114
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.108-114

শিশু মনস্তত্ত্ব: রবীন্দ্রনাথ

ড.দেবযানী ভৌমিক(চক্রবর্তী)

সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Rabindranath Tagore had created effortlessly into almost every branch of literature. And in all genre he was the most successful creator. In the pre-modern age psychological impact of characters was less executed in literature.He was the first one to express the words of heart in a conscious manner. His way of observation of the mind was perfect. He elastrated such kind of observation power even for children. An evidence of it was seen in his primar Sahajpaath. Apart from this, his understanding of the children mind has been executed in his novels, short stories, poems and so on. For example, in his poem a young child ask his mother, "where did I come from?". The simple curiosity of the young heart has been picturised in this poem.

Keywords: Psychological, Observation, Elastrated, Children, Heart.

মানুষকে চালিত করে মন৷ মনের গতিপ্রকৃতি বিচিত্র, যা উপলব্ধি করাও বেশ বিচক্ষণতার কাজ৷ আধুনিকপূর্ব বাংলাসাহিত্যে চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক আলেখ্য রূপায়ণ সেভাবে চোখে পড়ে না। দেবমাহাত্ম্যমূলক কাহিনিতে চরিত্রগুলিকে বিশেষ অধ্যাত্মমুখী পরিণতিই দিয়েছেন স্রষ্টাগণ৷ চরিত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা মানসিক টানাপোড়েন অথবা মনের বিচিত্র রূপের প্রকাশ আধুনিকতম সাহিত্যেরই লক্ষণ৷ মনস্তত্ত্বকে সুচারুভাবে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর৷ উল্লেখ করা যায় তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসের কথা৷ যেখানে তিনি নিজেই ব্যবহার করেছেন চরিত্রের 'আঁতের কথা'[১] শব্দবন্ধটি৷ এই আঁত বা অন্তরের কথার উদ্ঘাটনই তো মনস্তত্ত্ব৷ এখানে আলোচ্য শিশু-মনস্তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর৷ সেক্ষেত্রে ছোটদের নিয়ে তাঁর বিভিন্ন রচনাই মূলত আলোচনাসূত্রে আসবে৷

আলোচনার শুরুতে অবশ্য শিশুশিক্ষার প্রথম ধাপ যে গ্রন্থের মাধ্যমে হয় সেই প্রাইমারের কথায় আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ রচিত বাংলা ভাষার একটি অন্যতম প্রাইমার হল 'সহজ পাঠ'। গ্রন্থটি দুটি ভাগে লিখিত। শিশুদের ইংরেজি এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন, যেগুলি বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ডে পাওয়া যায়৷ লেখাগুলি আন্তরিকভাবে পাঠ করলেই বুঝতে পারা যাবে যে রবিঠাকুর কতটা বুঝতেন শিশুদের মনকে৷ অনেক সহজ ভাষায় শিশুদের কাছে আকর্ষণযোগ্য করে তিনি সেগুলি পরিবেশন করেছেন৷ প্রাইমার হল শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম ধাপ, যার মাধ্যমে শিশু

ভাষাকে শুদ্ধভাবে পড়তে লিখতে তথা বলতে শেখে৷ কিছু কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান ঘটিয়ে শিশুকে শব্দ উচ্চারণ শেখানো হয়, তারপর শব্দযোগে বাক্যগঠন করা হয়৷ প্রাইমারের মাধ্যমে শিশুর বৌদ্ধিক মননের বিকাশ ঘটানো হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ গ্রন্থের প্রথম ভাগে দেখা যায় Alphabetic পদ্ধতির প্রয়োগে শিশুকে বর্ণজ্ঞান দেওয়া হচ্ছে৷ শুরুতেই 'অ আ ছোটো খোকা বলে অ আ/ শেখেনি সে কথা কওয়া৷'[২] শিশুর আধো আধো বাক্যস্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় অক্ষর জ্ঞান৷ তাই যখন তারা অ আ শেখে তখন তারা ঠিক মতো কথাও বলতে পারে না৷ রবিঠাকুর অবশ্য বেশ কিছু বর্ণের সঙ্গে পরিচয় ঘটাননি৷ যেমন য়্ ,ৎ , ড়্ , ঢ়্ , ং, ঃ। ক্ষ-কে একক বর্ণের তালিকায় রেখেছেন৷ এছাড়া আরও কিছু বিষয় নিয়ে সমালোচকগণ প্রশ্ন তুললেও এখানে যে গদ্যের বা কবিতার অংশ রয়েছে সেগুলির মাধ্যমে শিশুর মনের বিকাশ ঘটতে পারে সহজেই। এমন সুন্দর বর্ণনা, যার মাধ্যমে শিশুর মনে একটা রূপকল্প তৈরি হতে পারে, যা গভীর প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

শিশুদের মনে রেখাপাত করার মতোই তাঁর 'বনে থাকে বাঘ৷/ গাছে থাকে পাখি'[৩]--- নামে প্রথম পাঠ রচনাংশ৷ বিভিন্ন পশু পাখি বা পতঙ্গের অবস্থানগত বৈচিত্র্য বর্ণনা করেছেন৷ ছোট্ট ছোট্ট সরল বাক্যে শিশু মনের পক্ষে আরামযোগ্য বক্তব্য পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রনাথ৷ সর্বমোট দশটি পাঠে গদ্য ও পদ্যের মাধ্যমে শিশুর মানস ভ্রমণ ঘটিয়েছেন৷ যার মাধ্যমে নিজের চতুর্দিকের জগৎকে চিনতে শেখে শিশু৷ অনেক সময় সহজ করে অনেক দার্শনিক কথাও বলে দিয়েছেন রবিঠাকুর৷ যেমন চতুর্থ পাঠে একস্থানে বলছেন--- 'পাখি কি ওড়ে? না, পাখি ওড়ে না, ওর পায়ে বেড়ি৷ ও আগে ছিল বনে৷ বনে নদী ছিল, ও নিজে গিয়ে জল খেত। দীনু এই পাখি পোষে৷'[৪] --- অর্থাৎ পরাধীন সত্তার পায়ে বেড়ি৷ তারা পোষ্য৷ উড়ে বেরানোর স্বাধীনতা না থাকলে পাখির যেমন অসহায় অবস্থা --- এর মধ্য দিয়ে পরাধীন মানব সত্তার সঙ্কুচিত অবস্থানটিকেও তিনি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন৷ এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবেই মনে হয় যে ছোটদের জন্য লেখার আবেদন সর্বজনে কিন্তু বড়দের জন্য লেখার পাঠক শুধু বড়রাই৷

প্রতিটি শিশুর মনেই রেখাপাত করার মতো পঞ্চম পাঠের 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,'৫ কবিতাটি কিংবা ষষ্ঠ পাঠের 'এসেছে শরৎ; হিমের পরশ'৬ কবিতাটি৷ কী অসাধারণ চিত্রকল্প! যেন ছবি হয়ে ফুটে ওঠে দৃশ্যপট৷ আমাদের ভাবতে অবাক লাগে জমিদার-পুত্র এবং স্বয়ং জমিদারি কাজে যুক্ত থেকেও গ্রাম বাংলার দেহাতি মানুষদের জীবনচিত্র তিনি কীভাবে আঁকলেন! আসলে নিখুঁত পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল বলেই তো তিনি বিশ্বের কবি৷ নিজেকে বিশ্বজনীন সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করতেই তিনি নিজেও বেশি স্বস্তি বোধ করতেন৷ তাঁর 'ন্যাশনালিসম্ ' প্রবন্ধে তো তিনি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করে আন্তর্জাতিকতাবোধেই আস্থা পোষণ করেছেন৷ তাঁর উৎসর্গ কাব্যের[১৬] সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছেন--- 'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি / দেখা দিলে আজ কী বেশে৷/ দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে,/ দেখিনু তোমারে স্বদেশে৷'[৭] --- এই যে বিশ্বদেবতার মুখ স্বদেশের আকাশে দেখা--- এর চেয়ে বড় মানবতাবাদ আর কীই বা হতে পারে!

দেখার চোখটি অনেক বেশি স্বচ্ছ ছিল বলেই তিনি অতি সহজ ভাষায় শিশুর মনের উপরেও রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন৷ বাংলার শিশুদের জন্য রচিত প্রাইমারে এই বাংলারই মাঠ-ঘাট-নদী-ফুল-পাখি-জনমানবের নিখুঁত বর্ণনা করেছেন৷ কোথাও এতটুকু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় না৷ তিনি নিজেই 'খাপছাড়া' কাব্যের শুরুতে বলেছিলেন --- 'সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,/ সহজ কথা যায় না লেখা সহজে৷'৮

অথচ সেই কঠিন কাজটি তিনি বেশ সহজেই করেছেন এই প্রাইমারের ক্ষেত্রে৷ সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগে কী অনবদ্য তাঁর 'কত দিন ভাবে ফুল উড়ে যাব কবে,/ যেথা খুশি সেথা যাব ভারি মজা হবে৷'৯ ---কবিতাটি৷ যেখানে ফুল, প্রদীপের আলো, পুকুরের জল নিজেদের স্থির অবস্থান থেকে অথবা একস্থানে বদ্ধ হয়ে পড়ে যে একঘেয়ে দিনাতিপাত সেখান থেকে মুক্তির পাখায় ভর করে উড়ে যেতে চেয়েছে৷ আবার তাদের সূত্র ধরেই শিশুরূপী কবিও ভাবছেন 'আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার,/ কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার৷/ কভু ভাবি পাখি হয়ে উড়িব গগনে৷/ কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে?'১০ প্রতিটি শিশুর মনের কথা তো এটাই৷ এখানেই তিনি সার্থক স্রষ্টা।

'সহজ পাঠ' দ্বিতীয় ভাগ-এর প্রথম পাঠে গদ্যের মাধ্যমে অনুস্বার-এর ব্যবহার বুঝিয়েছেন৷ দ্বিতীয় পাঠে য-ফলার ব্যবহার দেখিয়েছেন৷ গল্পের মাধ্যমে বলায় তা শিশুর মনে ভারবাহী হয় নি৷ শিশুমন তো গল্পই খোঁজে৷ কাজেই গল্পের মধ্যে রূপকল্প তৈরি করে রবিঠাকুর অনায়াসেই অনুস্বার ও য-ফলার ব্যবহারগত দিকটা বুঝিয়ে দিয়েছেন৷ এর পরেই সেই অনবদ্য 'হাট'[১১] কবিতাটি৷ যেখানে বক্সীগঞ্জের পদ্মাপারে শুক্রবারে যে হাট বসে, তাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ মানবজীবন তথা দৈনন্দিন ব্যবহার্য বাসনপত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাক-সবজির নিখুঁত বর্ণনা আছে৷ হাটে বিকোনো শীতের নকশাকাটা র‍্যাপারও কবির দৃষ্টি এড়ায় না৷ চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন বেতের বোনা ঝামাকুলো। এ কবিতার আবেদন শিশুদের কাছে আজও সমান৷ আর পরিণত মানুষের কাছে তো তা শাশ্বত আবেদনময়৷

পরবর্তী পাঠগুলিতে গল্প বলার কৌশলে কবি যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার শিখিয়েছেন৷ যেমন মঙ্গলবারে জঙ্গল সাফ করার গল্পে ঙ্গ-এর, চন্দননগরের আনন্দবাবুর গল্পে ন্দ, আবার পঞ্চম পাঠের বর্ষার বর্ণনায় রেফের ব্যবহার শিখিয়েছেন কবি৷ একটি ছড়ার[১২] মাধ্যমে শিশুমনে মায়ের স্থান যে কতটা গভীর তা বুঝিয়েছেন৷ ছোট্ট শিশু মাকে সঙ্গে নিয়ে জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে ঘর বানিয়ে থাকতে চায়৷ মাকে সমস্ত জীবজন্তু থেকে একাই রক্ষা করবে ছোট্ট শিশুটি ---এই তার অভিলাষ৷ কিছু পশুপাখি তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে আনুগত্য প্রদর্শন করবে৷ কী অসাধারণ শিশু মনের বাস্তব চিত্র! কোথাও এতটুকু বাড়তি মনে হয় না৷ সহজ পাঠের দ্বিতীয় ভাগে মোট তেরোটি পাঠ রয়েছে৷ প্রতিটি পাঠেই গদ্য ও পদ্যের মাধ্যমে কাহিনি বলে তিনি শিশু মনের প্রসার ঘটাতে চেয়েছেন৷ আবার শিশুর জানার জগৎকেও বিস্তৃত করেছেন৷ গল্পের সার্বিক আকর্ষণের বিষয়টি তো আছেই; তারই সঙ্গে শিশু মনের কল্পনানির্ভরতার জায়গাটিও গুরুত্ব পেয়েছে।

নবম পাঠের অন্তর্গত 'সেদিন ভোরে দেখি উঠে'[১৩] শীর্ষক কবিতাটি প্রতিটি শিশুর মনেই বিশেষ ভাবুকতা জাগিয়ে তুলতে বাধ্য৷ ভোরে উঠে শিশু বৃষ্টিধৌত প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্যে মুগ্ধ৷ ঝিলিমিলি রৌদ্র, পুজোর ছুটিতে দূর থেকে সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে৷ ছোট্ট মেয়েটি দূরে কারো ছাদের উপর বেগনি রঙের শাড়ি রোদে মেলছে। কবির শিশুমন অনুভব করছে সেখানেই রয়েছে রাজার বাড়ি৷ মেঘে ওড়া পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়াটি পেলে তিনি তখনই রওনা দিতেন সেখানে। কীভাবে যেন ব্যক্তিগত অনুভূতি সর্বজনীন হয়ে যায়৷ সকল শিশুরই মনের কথা হয়ে দাঁড়ায় এ কবিতা। রবীন্দ্রপ্রতিভার শীর্ষবিন্দুটি স্পর্শ করেছে কবিতা। তবে গদ্যেও তিনি রাজাধিরাজ৷ সহজ পাঠ-এর গদ্যগুলির মাধ্যমে তিনি শিশুমনে অতি সন্তর্পনে মূল্যবোধ গড়ে তোলার কাজটিও করেছেন৷ পরধর্ম সহিষ্ণুতা তথা ধৈর্য, পরোপচিকীর্ষা, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি শুভবোধ বিভিন্ন গল্পচ্ছলে শিশুমনে ভরে দিয়েছেন তিনি৷ আবার কখনও কলকাতা শহরের বাস্তব অবস্থা নিয়ে বেশ

মজার ভঙ্গিতে গুরুতর কথাই বলেছেন কবিতার ছাঁদে। সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের শেষ পাঠ অর্থাৎ ত্রয়োদশ পাঠের কবিতাটি শিশুদের শুধুমাত্র নয় পরিণত বয়সীদেরও অত্যন্ত প্রাণের৷ কবিতাটির শুরু হচ্ছে এভাবে--- 'অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে/ পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে'।[১৪] এখানে অন্ধ কুঞ্জবিহারী, অসহায় নিঃস্ব৷ স্থানীয় জমিদারের অন্নেই তাঁর প্রতিপালন ঘটে৷ তাঁর গানে জগৎ মুগ্ধ৷ সাঙ্গীতিক আবেদন এমনভাবে সকলকে স্পর্শ করে যে সকলে অনায়াসেই তাঁকে কাছের করে নেন৷ এই কুঞ্জের গানের সুরমূর্ছনায় শরতের আকাশ কীভাবে মুখরিত হয়ে ওঠে তার বর্ণনা দিয়েই সহজ পাঠ সমাপ্ত হয়েছে৷ সার্বিকভাবে শিশু-মনস্তত্ত্ব রবিঠাকুর যে কতটা বুঝতেন তারই প্রমাণ এই গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে শিশুর কথা বা শিশুর মনোলোকের উদ্ভাস যেভাবে পাওয়া যায় তাতে আমরা দেখি শিশুকে তিনি কিছু ক্ষেত্রে সংকটের কালে এনেছেন৷ কাহিনিতে সংকট মোচনের সূত্র হিসেবে যেন শিশুর আবির্ভাব৷ বিশেষ করে তাঁর কথাসাহিত্যে৷ যেমন ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নায়িকা কুমুদিনী৷ তাঁর মধ্যে প্রবলভাবেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ৷ আবার সহজাত বাৎসল্যপ্রবণতা তাঁকে মায়ের ভূমিকাতেও আসীন করে৷ যদিও তাঁর নিজের কথাতেই 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।'[১৫] কিন্তু তাঁর জীবনে সংকট যখন ঘনিয়ে উঠেছে তখন ছোট জায়ের পুত্র মোতিকে আশ্রয় করে সে তার দুঃখ অপমান ও বঞ্চনা ভুলতে চেয়েছে৷ 'গোপাল' বলে মোতিকে কোলে তুলে নিয়ে জননীর উপলব্ধিগত সান্ত্বনা বা শান্তি তাকে কিছুটা স্বস্তি নিশ্চয়ই দিয়েছিল৷ ছোট্ট মোতি তার সহজ মনের আবেদনে তার জেঠিমা কুমুদিনীকে যে এলাচদানা দিয়েছে তা পরম আদরে গ্রহণ করেছে কুমু৷ রবীন্দ্র-উপন্যাসে শিশু চরিত্রের অবস্থান বিশেষ নেই, রাজর্ষি ও যোগাযোগ-এই শিশু রয়েছে। শেষের কবিতায় সুরমা ও যতিশংকর ছোট তবে ঠিক শিশু নয়।

রবীন্দ্র-ছোটগল্পে বেশ কিছু শিশুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়৷ যেখানে কথাকার রবীন্দ্রনাথ শিশুর মনস্তত্ত্ব বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন৷ তাঁর 'ফেল' গল্পে নবগোপালের ছেলে নলিন ও ননীগোপালের ছেলে নন্দর ছোটবেলাটা বেশ বাস্তবোচিত ভঙ্গিতে লেখক বর্ণনা করেছেন৷ সেক্ষেত্রে নবগোপাল তাঁর ছেলের পড়াশুনার বিষয়ে অত্যন্ত কড়া। অন্যদিকে ননীগোপাল আবার ছেলের শাসনের বিষয়ে যথেষ্ট শৈথিল্য দেখাতেন। এমনকি ছেলেকে বেশ অর্থ দিয়েও স্কুলে পাঠাতেন। বন্ধুদের সেই অর্থে খাইয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল নন্দ৷ ফলে নলিনের মধ্যে শিশুর স্বাভাবিক মানসিকতাই কাজ করত৷ পরাভবের গ্লানি থেকে সে ভাবত --- '...নন্দর বাবা যদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত, তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।'[১৬] শিশুর মধ্যে তো এহেন জয়ের নেশা স্বাভাবিক৷ 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে ছোট্ট মিনি, সে কিন্তু বড়দের মতো রহমতকে দেখে সন্দেহপ্রবণতায় ভয় পায়নি৷ বরং সহজ বিশ্বাসে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছে৷ শিশুমনের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। 'ছুটি' গল্পে ফটিক, মাখন, বাঘা-ইত্যাদি শিশুর মাধ্যমে শিশুর দৌরাত্ম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে৷ গ্রাম্য সমাজে প্রকৃতির উন্মুক্ত অঞ্চলে লালিত শিশুর মনে ভালোবাসার জন্য কাঙালপনা এখানে ফটিক চরিত্রটির মধ্যে দেখি৷ মামাকে পেয়ে তাঁর বাড়ি যাবার জন্যে ফটিক অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু শহরের জীবন, স্কুলের নিয়মানুবর্তিতা তথা শিক্ষকের ভৎর্সনা ও শারীরিক লাঞ্ছনা সব মিলিয়ে তেরো-চোদ্দ বছরের ফটিকের মন একেবারে বিপর্যস্ত। স্কুলের বই হারিয়ে মামীর কাছে অপমানিত হয়ে নিজের হীন অবস্থানটি সে অনুভব করতে পারে৷ মায়ের ওপরেও অভিমান হয়৷ জ্বর আসে ফটিকের৷ মায়ের উদ্দেশে সে রওনা দেয়। কিন্তু মামা বিশ্বম্ভরবাবু পুলিসের সহায়তায় তাকে ফিরিয়ে আনেন৷ কিন্তু জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকে সে 'এক বাঁও মেলে না৷ দো বাঁও মেলে--- এ-এ না।'[১৭] শিশুমনেও

যে আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল থাকে তারই প্রমাণ ফটিক চরিত্র। 'গিন্নি' গল্পে শ্রেণিকক্ষে র‍্যাগিং -এর মতন একটি বিষয় তখনই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। গল্পটি ১৮৯১ সালে লিখিত। আশু নামে একটি সুবোধ বালক তার বোনের সঙ্গে পুতুলের বিয়ে বিয়ে খেলছিল--- তা স্কুলের পণ্ডিতমশাই দেখে ফেলেন। পরদিন ক্লাসে সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি আশুকে 'গিন্নি' নামকরণ করেন। এতে অন্য ছাত্ররাও তাকে ঘিরে বিদ্রুপ শুরু করে। এতে আশুর শিশুমনে যে অপমানের জ্বালা --তা পাঠককেও অশ্রুসজল করে তোলে।

শিশুমনে মায়ের স্থান সর্বাগ্রে। শিশুর যাবতীয় জিজ্ঞাসা মায়ের কাছেই। রবীন্দ্রকবিতায় আমরা দেখেছি--- 'খোকা মাকে শুধায় ডেকে---/ 'এলেম আমি কোথা থেকে,/ কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'/ মা শুনে কয় হেসে কেঁদে/ খোকারে তার বুকে বেঁধে---/ 'ইচ্ছা হয়েছিলি মনের মাঝারে।'[১৮] ---এখানে শিশুমনের স্বাভাবিক জানার আকুতি প্রকাশিত। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ মায়ের মুখে যে উত্তর বসিয়েছেন তা কিন্তু আর যাই হোক শিশুর বোঝার উপযুক্ত নয়। কিন্তু কবি ভবিষ্যতের উদ্দেশেই ছেড়ে রেখেছেন মন্তব্যটি। শিশুকে কোনও কাল্পনিক কাহিনি শোনাননি মা। তিনি সরাসরি বলেছেন---'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।' রবিঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর অকাল প্রয়াণের পর তাঁর শিশুপুত্র শমীন্দ্রনাথের অসহায়তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তখনই রচনা করেন 'শিশু' কাব্যটি। এটিরই প্রথম কবিতা 'জন্মকথা' -য় এই বক্তব্য পাই আমরা। শিশুমনে মায়ের প্রতি ভালোবাসা একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। সেই মাকে হারিয়ে সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে শিশু। এই কাব্যেরই 'ভিতরে ও বাহিরে' কবিতায় রয়েছে---'খোকা থাকে জগৎ-মায়ের/ অন্তঃপুরে---/ তাই সে শোনে কত যে গান / কতই সুরে।'[১৯] 'প্রশ্ন' কবিতায় শিশু তার মনের স্বাভাবিক চাহিদা মতোই মাকে প্রশ্ন করেছে---'একদিনও কি দুপুরবেলা হলে হলে/ বিকেল হল মনে করতে নাই?'[২০] ---কল্পনাপ্রবণতা শিশুমনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এছাড়া ছোটবেলায় পড়াশুনার থেকে খেলাধূলাতেই শিশুমন অধিক আগ্রহ বোধ করে। তাই তো শিশু পড়া পড়া খেলার কথা মাকে বলছে। সহজ সরল শিশুমনে স্বাভাবিক যুক্তিপ্রবণতাও বিরাজ করে। আর তা থেকেই শিশু বলেছে রাতের বেলা দুপুর হলে দুপুর বেলা কেন রাত হবে না? 'সমব্যথী'[২১] কবিতায় শিশুমনে পশু পাখির প্রতি যে ভালোবাসা থাকে তারই চিত্র। সেখানেও মার প্রতি অভিমানে খোকা বলছে যদি সে খোকা না হয়ে কুকুর বা টিয়াপাখি হত, তাহলে কি মা তাকে কোলে নিতেন? না কি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন? খোকা মনের দুঃখে বনে চলে যেতে চায় তাই। 'শিশু' কাব্যের আর একটি অনবদ্য কবিতা 'বীরপুরুষ'। যেখানে শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে রবিঠাকুরের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ আরো ভালো করে ধরা পড়েছে। শিশুটি তার কল্পনায় দেখছে মাকে নিয়ে অনেক দূরে কোথাও যাওয়ার পথে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু মাকে প্রতি মূহূর্তে সাহস যোগাচ্ছে সাধ্যমতো খোকা---'আমি আছি, ভয় কেন মা করা'[২২] অনেক যুদ্ধ, অবশেষে খোকার জয়। মা তাকে কত বাহবাই দিচ্ছেন। দাদা যদিও এ কথা বিশ্বাসই করবে না। কিন্তু পাড়ার লোকেরা শুনে বলত---'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।' মায়ের প্রতি অদম্য ভালোবাসা থেকেই মাকে আপ্রাণ রক্ষা করবার প্রয়াস শিশুমনে। আর সে জন্যই শিশু মন চায় মাকে নিরুপদ্রব রাখতে। মাকে রক্ষার তাগিদে বীরপুরুষ হতে চাওয়া শিশুর সহজাত মনোধর্ম। 'মাঝি'[২৩] কবিতায় শিশুটি খেয়াঘাটের মাঝি হতে চেয়েছে। বাবার মতো সে বিদেশে যেতে চায় না। তাহলে যে খিদে পেলেই মার কাছে ছুটে আসা যাবে না।

শিশু মনের নিখুঁত রূপকার রবিঠাকুর, এ কথা বলাই যায়৷ তিনি নিজে তো শিশু বয়সে লেখেন নি শিশুদের নিয়ে৷ বরং পরিণত বুদ্ধিতেই নিখুঁত পর্যবেক্ষণসহ তিনি শিশুমনের অন্বেষণ করেছেন তাঁর লেখার মাধ্যমে৷ সে জন্যই অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই শিশু মনের প্রকৃত রূপ প্রকাশেও তিনি সার্থকতা দেখিয়েছেন৷

গ্রন্থপঞ্জী:

১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'চোখের বালি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০) পৃষ্ঠা: ৩৭৩
২) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সহজ পাঠ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০) পৃষ্ঠা: ৪৪৩
৩) ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৪৪
৪) ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৪৭
৫)ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৪৮
৬) ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৪৯
৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'উৎসর্গ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০) পৃষ্ঠা: ৯৩
৮) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'খাপছাড়া', রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড (৬আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০) পৃষ্ঠা: ১
৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সহজ পাঠ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০) পৃষ্ঠা: ৪৫৩
১০) ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৫৩
১১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'হাট', রবীন্দ্র-রচনাবলী,পঞ্চদশ খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০) পৃষ্ঠা: ৪৫৭
১২) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সহজ পাঠ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসী রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ১৪১০) পৃষ্ঠা: ৪৫৮
১৩) ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৬১
১৪) ঐ,পৃষ্ঠা: ৪৬৬
১৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'যোগাযোগ', পরি-৫৭, রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ (বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, মাঘ ১৪০৪) পৃষ্ঠা: ১০৯৯
১৬) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'ফেল',রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা১৭, বিশ্বভারতী, ১৪১০) পৃষ্ঠা-৩৬৮
১৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'গিন্নি' গল্পগুচ্ছ, (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৫) পৃষ্ঠা: ২০
১৮) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'জন্মকথা', রবীন্দ্র-রচনাবলী,পঞ্চম খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা১৭, বিশ্বভারতী, ১৪১০) পৃষ্ঠা: ৭

১৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'ভিতরে ও বাহিরে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, পৌষ ১৪১০), পৃষ্ঠা: ১৮

২০) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'প্রশ্ন', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০) পৃষ্ঠা: ২০

২১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সমব্যথী', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০) পৃষ্ঠা: ২০

২২) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ,'বীরপুরুষ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড (৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০) পৃষ্ঠা: ২৮

২৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'মাঝি', রবীন্দ্র-রচনাবলী,পঞ্চম খণ্ড(৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০) পৃষ্ঠা: ৩০